বাংলা কবিতায় নজরুলের অবদান

রফিক হাসান

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা কবিতার বিস্ময়কর প্রতিভা। মাত্র দুই দশকের সাহিত্য জীবনে বাংলা ভাষায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তা অদূর ভবিষ্যতে মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা একবারেই ক্ষীণ। বরং বলা হয় বাংলা ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে নজরুল ও এই ভাষাভাষি মানুষের অন্তরে টিকে থাকবে।

সাহিত্যাঙ্গন থেকে নজরুলকে মুছে ফেলার সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বরং দিন দিন নজরুল চর্চার পরিধি ও ব্যাপ্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অসামান্য অবদান। সাহিত্যের খুব কম এলাকা রয়েছে যেখানে নজরুলের হাত পড়েনি এবং সোনালি ফসলে গোলা ভরে ওঠেনি। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং সাংবাদিকতাসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার ব্যাপক অবদান রয়েছে। এমনকি তিনি কয়েকটি সিনেমায়ও অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়।

কাজেই আমরা বাংলা সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক অবদানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। তারপরও হয়ত অনেক বিষয় ও ক্ষেত্র আমাদের আলোচনার বাইরে থেকে যেতে পারে। আমরা চেষ্টা করবো মূল অবদানগুলো সংক্ষেপে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে। যাতে পাঠকরা আমাদের জাতীয় কবির অবদান সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধরণা লাভ করতে পারেন।

প্রথমত আসা যাক কবিতার কথায়; যেটি শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে মহত্তম বিষয়। শিল্প-সাহিত্যে যতগুলো এলাকা রয়েছে তার মধ্যে সবার উপরে হচ্ছে কবিতা। কারণ মানুষের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতার চেয়ে মহত্তম আর কোনো মাধ্যম নেই। আদি কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ কবিতার মাধ্যমে তাদের মনের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার কথা প্রকাশ করে আসছে। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে কবিতার আগমন ঘটেছে সবার আগে। তার পরে এসেছে অন্যান্য মাধ্যম।

বাংলা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলাম একটি নতুন কাব্যভাষা উপহার দিয়েছেন। যে ভাষাটি এতদাঞ্চলে বসবাসকারী বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী শতশত বছর ধরে ব্যবহার করে আসছিল। একবারে শুরু থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম প্রচুর আরবী, ফার্সি শব্দ সম্বলিত কবিতা লিখে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত কবিতার এই নতুন ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহারের প্রশংসা করেন।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের যখন আগমন ঘটে তখন বাংলা ভাষা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। ক্ষমতাসীন ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বাংলাভাষা সংস্কারের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তত্ত্বাবধানে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্মেষ ঘটছিল। ভাষা সংস্কারের নামে তারা বাংলা ভাষা থেকে যতটা সম্ভব আরবি, ফার্সি ও উর্দু শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃতনির্ভর একটি ভাষা নির্মাণের প্রয়াস চালাচ্ছিল।

কলকাতার নব্য ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই ভাষায় সাহিত্য রচনায় খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এমনকি মুসলিম সাহিত্যিকরাও এই ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মীর মশাররফ রচিত বিষাদ সিন্ধু। সেখানে আরবি, ফার্সি শব্দের উপস্থিতি একবারেই নগণ্য। এজন্য অনেক হিন্দু লেখক এবং সাহিত্যিক এর প্রশংসা করেছেন এই বলে যে এই বইয়ে পিঁয়াজ রসুনের গন্ধ নেই। পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বলতে যে আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দই বোঝানো হয়েছে যা কি না তাদের কাছে মুসলমানি শব্দ হিসেবে খ্যাত তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

কাজী নজরুল ইসলামের আরবি ফার্সি শব্দবহুল কবিতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মহররম কবিতা।

নীলসিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া/আম্মা লাল তেরি খুনকিয়া খুনিয়া/কাঁদে কোন ক্রন্দসি কারবালা ফোরাতে/সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে/রুদ্র মাতম ওঠে দুনিয়া দামেস্কে/জয়নালে পরালে এ খুনিয়ারা বেশকে?

এই কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্রে বাংলা শব্দ রীতিমত খুঁজে বের করতে হয়। অথচ এটি একটি বাংলা কবিতা। এমন অভিনব কবিতা এর আগে বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে বলে জানা যায় না। এর আগে আরবি-ফার্সি শব্দবহুল সহিত্য রচিত হত পুঁথি হিসেবে। যা কি না বাংলার ঘরে ঘরে সুর করে পড়া হত। সেটা নিম্নশ্রেণির গ্রাম্য সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হত।

কিন্তু কাজী নজরুলের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি সেই ভাষাটিকে আধুনিক কবিতায় ব্যবহার করে অনন্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করে কবিতা লেখার ফলে বাংলা ভাষায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। নজরুলের আগের প্রজন্মের মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা তাদের লেখায় আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেন এবং কুণ্ঠা বোধ করতেন। কিন্তু নজরুলের আগমনের ফলে তাদের সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তাদের মনের আকাশ থেকে সবধরনের কুয়াশার মেঘ কেটে যায়। এর পর থেকে তারা প্রায় সবাই নির্বিঘ্ন চিত্তে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে সাহিত্য রচনা করেন এবং একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়।

এরপর আসা যাক নজরুলের আর একটি অবদানের কথায়। আর সেটি হচ্ছে নতুন ছন্দ। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করেন। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক ধরা হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তিনি যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে বাংলা কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সূচনা করেন। তিনি এই ছন্দের নানান দুর্বলতা ও অপূর্ণতা অপসারণ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই নতুন ছন্দের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপদেন। এই নবনির্মিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি চালের নাম মুক্তক। কাজী নজরুল ইসলামের আগে এর ব্যবহার দেখা যায়নি। নজরুল তার জগৎবিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'তে এই ছন্দের সফল প্রয়োগ ঘটান। বলা হয় মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের ব্যবহারের ফলেই কবিতাটি এতটা হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

বল বীর/বল উন্নত মম শির/শির নেহারী নত শির/ঐ শিখর হিমাদ্রির/বল বীর/ বল মহাবিশ্বের/মহাকাশ ফাড়ি/চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি/ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া/ উঠিয়াছি চির বিস্ময়/ আমি বিশ্ব বিধাতৃর/

বিদ্রোহী কবিতার এই কয়েকটি লাইন পড়েই পাঠক বুঝে যান যে এটি প্রচলিত কোন ছন্দে রচিত নয়। এর বিষয় বক্তব্য যেমন নতুন ও অভিনব তেমনি এর ছন্দ। এরকম ছন্দে রচিত না হলে এই কবিতা কতটা সফল হত কি না সে

বিদ্রোহী কবিতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মধ্যে বহু মিথের ব্যবহার। নজরুল এই একটি মাত্র কবিতায় অসংখ্য মিথের ব্যবহার করেছেন। এই কবিতায় তিনি গ্রিক, মিশরীয়, মুসলিম এবং হিন্দু মিথের ব্যবহার করেছেন। একটি মাত্র কবিতায় এত মিথের ব্যবহার শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বরং পৃথিবীর ইতিহাসেও প্রায় ব্যতিক্রম।

বিতর্ক থেকেই যায়। নজরুলের পরে অনেক আধুনিক কবি এই ছন্দে কবিতা লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। ভবিষ্যতেও লেখা হবে। তবে প্রবর্তক হিসেবে এর কৃতিত্ব অনেকটা নজরুলের।

বিদ্রোহী কবিতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মধ্যে বহু মিথের ব্যবহার। নজরুল এই একটি মাত্র কবিতায় অসংখ্য মিথের ব্যবহার করেছেন। এই কবিতায় তিনি গ্রিক, মিশরীয়, মুসলিম এবং হিন্দু মিথের ব্যবহার করেছেন। একটি মাত্র কবিতায় এত মিথের ব্যবহার শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বরং পৃথিবীর ইতিহাসেও প্রায় ব্যতিক্রম। তিনি একটি মাত্র কবিতায় পৃথিবীর প্রায় সবগুলো প্রধান অঞ্চলের মিথের ব্যবহার ঘটিয়েছেন। ফলে কবিতাটি অনন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছে।

নজরুল আর একটি বিপ্লব ঘটিয়েছেন এদেশের মানুষের মাঝে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে। তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন যাতে এদেশের বৃহত্তর দুই জনগোষ্ঠী হিন্দু-মুসলিমের মাঝে সম্প্রীতি বজায় থাকে। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ভাবটি কিন্তু ইংরেজদের সুদূর প্রসারী নীল নকশার অংশ। ইংরেজরা সুকৌশলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এখানে তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছে। যেহেতু তারা বহিরাগত এবং দখলদার সেজন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকলে তাদেরকে শিঘ্রই এখান থেকে লেজ গুটিয়ে চলে যেতে হত। অনেক হিন্দু লেখক জেনে অথবা না জেনে ইংরেজদের পাতা সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন। কিন্তু নজরুল শুরু থেকেই এব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি সারা জীবন চেয়েছেন দুই সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখতে। কবিতা গান গল্প উপন্যাস ও নাটকে নজরুলের এই প্রবনতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কারণ আমরা যদি একটু পেছন ফিরে দেখি তাহলে দেখবো যে, ইংরেজদের আগমনের আগে এখানে যে কবিতা বা সাহিত্যের চর্চা ছিল তাতে কিন্তু এই বিরোধের সুরটি অনুপস্থিত। সেখানেও বরং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ঐক্যের সুর ছিল। মধ্যযুগের সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। নজরুল সেই চেতনারই পুনরুজ্জীবন চেয়েছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে ক্ষমতাসীনরা সুপরিকল্পিতভাবে ইংরেজ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে এদেশের বৃহত্তর দুই জনগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নানান পায়তারা কষতে থাকে। রাজনৈতিকভাবে যেমন ডিভাইড অ্যান্ড রুল পরিকল্পনা অবলম্বন করে ঠিক তেমনিভাবে সাহিত্য সংস্কৃতিতেও দুই সম্প্রদায়ের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে।

কাজী নজরুল ইসলামের আগে কবিতাকে ধরা হত অভিজাত শ্রেণির বিলাসী কর্মের একটি হিসেবে। কবিতায় গণমানুষের কথা বলার প্রচলন তখনও হয়নি। কবিতা পাঠ হত বিভিন্ন রাজ দরবারে। উচ্চ শ্রেণির শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিল কবিতার সমজদার। কিন্তু কবিতায় যে গণমানুষের কথা বলা যায়, তাদের সুখদুঃখ দাবী দাওয়া অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো যায়; সেটা বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখান কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথও প্রথম দেখান তিনি। তিনিই সেই কবি যিনি এদেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য কোমরে গামছা বেঁধে আদাজল খেয়ে নেমেছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে মাসের পর মাস জেল খেটেছেন। প্রবল নির্যাতন নিপীড়নের পরও তাকে এই পথ থেকে এক চুল ও সরানো যায়নি।

তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাদেশিক। নজরুল মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এ দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নে। তিনি মনে করতেন ইংরেজরা এদেশের শত্রু। কাজেই আমরা বলতে পারি সাহিত্যে দেশপ্রেম বা স্বদেশিকতার উন্মেষও নজরুলের অবদান। এরপর দেশপ্রেম ও ভারত স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে বহু গান কবিতা লেখা হয়েছে। মানষের মন মগজে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে সেসব গান কবিতার অবদান প্রবল। যার ফলে ইংরেজদের আর এ দেশে থাকা সম্ভব হয়নি।

নজরুল একই সাথে ইসলামী, শ্যামা সংগীত, আধুনিক ও আঞ্চলিক, পল্লী গীতি রচনা করেন। বাংলা ইসলামী গানে তিনি আজও অনন্য। ইসলামী গান অনেকেই রচনা করেছেন, কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত নজরুলকে অতিক্রম করতে পারেননি। বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবে নজরুলের গান ছাড়া জমে না। একই সাথে তার রোমান্টিক ও প্রেমের গান এখনও বিপুল জনপ্রিয়। এসব অবদানের কারণে নজরুল এখনও অনিবার্য। তাঁকে বাংলা সাহিত্য থেকে মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা হলেও সম্ভব হয়নি। তিনি বাংলাদেশের মত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জাতীয় কবি। বাংলা সাহিত্য যতদিন বেঁচে থাকবে নজরুলও ততদিন বাংলা ভাষাভাষি মানুষের মনে জাগরুক থাকবেন।